দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আমরা এ অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে জানব। ইসলামে কি কি ইবাদাত রয়েছে এবং সেগুলো করার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কী তা জেনে নিয়ে আমরা নিয়ম মেনে সে ইবাদাতগুলো পালন করতে চেষ্টা করব। আগের অধ্যায়ের মতো এ অধ্যায়েও তুমি একা বা বন্ধুরা মিলে আনন্দের সাথে এ সকল ইবাদাত পালন করবে। সেই সঙ্গে শিক্ষকও তোমাদের কিছু অনুশীলন করাবেন। এসব কাজ করতে করতেই তুমি ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে শিখে যাবে।

তাহলে শুরু করা যাক।

ইবাদাত সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা

ইবাদাত করতে হলে শুরুতেই আমাদের জেনে নিতে হবে যে এ ইবাদাতগুলো কি কি আর কীভাবে এগুলো পালন করতে হয়। তাই এ অধ্যায়ের শুরুতেই শিক্ষক তোমাদের সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবেন। এ ছাড়া এ বইটি পড়েও তুমি ইসলামের বিভিন্ন ইবাদাত সম্পর্কে জানতে পারবে।

তাহলে, জেনে নেওয়া যাক।

ইবাদাত (اَلْعِبَادَةُ)

‘ইবাদাত’ আরবি শব্দ। এর অর্থ আনুগত্য করা। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইবাদাত। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি যেমন ইবাদাত, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধিবিধান মেনে পালন করাও ইবাদাত।

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের লালন-পালন করেন। আমাদের জীবন, মৃত্যু সবই তাঁর হাতে। তিনি আমাদের জন্য এ মহাবিশ্বকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। আকাশ-মাটি, চাঁদ-সূর্য, ফুল-ফল, নদী-নালা সবই তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা এসব উপভোগ করি। আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করার পর আমাদের এর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতে হবে। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলার নামই ইবাদাত।

মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ: 'আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬)

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানুষকে ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তাই সব সময় তাঁর ইবাদাতে মশগুল থাকা মানুষের কর্তব্য। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সবসময় কি ইবাদাত করা সম্ভব? হ্যাঁ দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই ইবাদাত করা সম্ভব। যেমন- আমরা খেতে বসলে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করি, তাহলে যতক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকবো, ততক্ষণ আল্লাহর রহমত পেতে থাকবো। এটিও একটি ইবাদাত। পড়ার সময় যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে পড়া শুরু করি, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়া করব, ততক্ষণই তা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে। একজন অন্ধলোক রাস্তা পার হতে পারছেন না, তাকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলে তা-ও আল্লাহর নিকট ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে। এভাবে সব সময়ই আমরা ইবাদাত করতে পারি।

ইবাদাতের অংশ হিসেবে আমরা ভালো কাজ করতে পারি। অন্যকে ভালো কাজ করার পরামর্শ দিতে পারি। এতে উভয়ই সমান সওয়াব পাবো। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পরামর্শ বা সন্ধান দেবে, সে ঐ কাজটি সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব পাবে।' (মুসলিম)

ইবাদাত করলে আল্লাহ খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখময় হয়। পরকালে জান্নাত লাভ করা যায়। আমরা আল্লাহর ইবাদাত করব, আল্লাহর পথে জীবনকে পরিচালিত করব। তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারব।

ইবাদাতের প্রকারভেদ

ইবাদাতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ইবাদাতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদাত: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে ইবাদাত করা হয়, তা হলো ইবাদাতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদাত। যেমন– দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ও রমযান মাসে রোযা রাখা।

২. ইবাদাতে মালি বা আর্থিক ইবাদাত: অর্থ বা সম্পদ দ্বারা যে ইবাদাত করা হয় তাকে বলা হয় ইবাদাতে মালি বা আর্থিক ইবাদাত। যেমন– যাকাত দেওয়া, সাদকা ও দান খয়রাত করা ইত্যাদি।

৩. ইবাদাতে বাদানি ও মালি বা শরীর ও অর্থ উভয়ের সংমিশ্রণে ইবাদাত: উল্লিখিত দুই প্রকার ইবাদাত ছাড়াও এমন কিছু ইবাদাত আছে যা শুধু শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কিংবা শুধু অর্থ দিয়ে সম্পন্ন করা যায় না; বরং শরীর এবং অর্থ উভয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন– হজ করা।

একক কাজ, উপস্থাপনা এবং আলোচনা

তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমরা ইবাদাত সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা লাভ করেছো। এখন তোমাদের প্রত্যেককে একটি কাজ করতে হবে। তাহলে এসো এবার দেখে নিই আমাদের কাজটি কী–

কাজ-৯: (বাড়ির কাজ)

তোমার আশেপাশে কে কীভাবে ইবাদাত করে তা জেনে এসে তোমার বন্ধুদের এবং শিক্ষককে জানাও।

তোমাদের পরিবারে, এলাকায়, বাড়ির পাশের মসজিদে বা রাস্তায় তুমি নিশ্চয়ই প্রতিদিন অনেক মানুষকে অনেকভাবে ইবাদাত করতে দেখো। ইবাদাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে হয়তো তুমি এতদিন বুঝতে পারোনি যে তাঁরা ইবাদাত করছেন। এখন তো তুমি জানো যে কীভাবে ইবাদাত করা হয়। তাহলে এখন তুমি আবারও তোমাদের আশেপাশে একটু ভালোভাবে দেখো। প্রয়োজনে তোমার পরিবারের সদস্যদের, পাড়া-প্রতিবেশীদের বা বিদ্যালয়ের বাইরের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। কে কীভাবে ইবাদাত করছে তা বুঝতে চেষ্টা করো এবং তোমার ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের বাড়ির কাজের খাতায় তা নোট করো।

নোট করা হয়ে গেলে এখন কী করবে? তুমি যা জেনেছ সেটা সবাইকে জানাতে হবে না? আর তোমার বন্ধুরা কে কী জানল সেটাও তো জানতে হবে, তাই না? তাহলে এবারের কাজ হলো–

কাজ-১০: (বাড়ির কাজ)

তোমাদের জেনে আসা ইবাদাতের ধরনগুলো শ্রেণিতে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

উপস্থাপনার মাধ্যমে তুমি যা জেনেছ সেটি যেমন তোমার বন্ধুরা জানতে পারল, তেমনি তোমার বন্ধুদের জানাগুলোও তুমি জানতে পারলে। এভাবে সবাই সবার জেনে আসা ইবাদতের ধরনগুলো সম্পর্কে জেনে গেলে!

এখন চেষ্টা করে দেখো তো, তোমরা সবাই যা জেনে এসেছ সেগুলোর কোনটি ইবাদাতের কোন প্রকারভেদের অন্তর্ভুক্ত, সেটি বের করতে পারো কিনা? এ কাজে প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নাও। তাহলে আমাদের এবারের কাজ হলো–

কাজ-১১: (বাড়ির কাজ)

তোমাদের সকলের জেনে আসা ইবাদাতগুলোর কোনটি ইবাদাতের কোন প্রকারভেদের অন্তর্গত তা নির্ণয় করো।

কাজ-১১ করতে গেলে তোমাদের কি কি করতে হবে, বলো তো? প্রথমেই তোমরা সবাই যা যা উপস্থাপন করেছ সেগুলোকে একত্রে লিখে ফেলতে হবে। তোমরা বন্ধুরা মিলে প্রথম অধ্যায়ের পাঠের সময় যেভাবে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করে পরে আবার সবাই একত্রে কাজ করেছিলে, এবারও সেভাবে কাজ করতে হবে। তাহলে তোমরা আশপাশের মানুষকে কীভাবে ইবাদাত করতে দেখছ সেগুলো একসঙ্গে লিখে ফেলো। তারপর কোন ইবাদাতটি ইবাদাতের কোন শ্রেণিবিভাগের অন্তর্গত সেটি পাশে লিখে ফেলো। কাজটি করতে গিয়ে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়, বা কোথাও বুঝতে না পারো, তাহলে শিক্ষকের সহায়তা নাও।

আরো জানি

এবার শিক্ষক তোমাদের সামনে ইবাদাতের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তোমাদের কাজ হলো শিক্ষকের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনা, বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করা এবং শিক্ষক কোনো কাজ দিলে সেটি সঠিকভাবে করার চেষ্টা করা।

শিক্ষক যেসব বিষয়ে আলোচনা করবেন, সেগুলোই এখন এখানে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হবে, যাতে শিক্ষকের আলোচনার পাশাপাশি বই থেকে পড়েও বিষয়গুলো সম্পর্কে তুমি জানতে পারো।

দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলনীয় কিছু ইবাদাত

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় ইমান গ্রহণের পরপরই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (নামায) আদায়, রমযান মাসে সাওম (রোযা) পালন, সামর্থ্যবান হলে হজ্জ পালন এবং যাকাত প্রদান ফরয বা অত্যাবশ্যক ইবাদাত। এগুলো তো পালন করতেই হবে। এর বাইরেও অনেক ভালো কাজ আছে যেগুলো পালনের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় উম্মত হিসেবে গণ্য হতে পারি। এবার এসো, দৈনন্দিন জীবনে পালন করা হয় এমন কিছু ইবাদাত সম্পর্কে জেনে নিই।

সালাম আদান-প্রদান

সালাম হলো ইসলামি অভিবাদন। সালামের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উন্নয়ন হয়। পরস্পরের দেখা সাক্ষাত হলে ‘আসসালামু আলাইকুম’ অর্থাৎ ‘আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক’ এর মাধ্যমে অপরের কল্যাণ কামনা করা হয় এবং অনুরূপভাবে ‘ওয়াআলাইকুমুস্ সালাম’ বলে সালামের জবাব দেওয়া হয়।

মুসাফাহা

মুসাফাহা শব্দের অর্থ হাতে হাত মেলানো। কোনো সাক্ষাৎকারীর হাত ধরে অভ্যর্থনা জানানোর নাম ‘মুসাফাহা’। ‘মুসাফাহা’ উভয় হাতে করতে হয়।

মু‘আনাকা

মু‘আনাকা অর্থ গলায় গলা মেলানো বা কোলাকুলি। কোনো ব্যক্তির সাথে দীর্ঘদিন পর বা সফর থেকে ফিরে আসার পর সাক্ষাৎ হলে কোলাকুলি করা সুন্নত। কোলাকুলিকারী উভয়ে গলা মিলাবে। কোলাকুলির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়।

কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। কুরআন তিলাওয়াত করা হলো নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত। কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তা‘আলা খুশি হন। হাদিসে বর্ণিত আছে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ (অক্ষর) তিলাওয়াতের জন্য ১০টি করে সাওয়াব বা পূণ্য লেখা হয়। (তিরমিজি)

তাসবিহ পাঠ

তাসবিহ অর্থ পবিত্রতা ঘোষণা করা, প্রশংসা করা, মহিমা ও গুণগান বর্ণনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসামূলক বাক্যকে তাসবিহ বলা হয়। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আক্‌বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি হলো তাসবিহ। তাসবিহ পাঠ অত্যন্ত পূণ্যের কাজ।

তাহারাত (اَلطَّهَارَةُ)

‘তাহারাত’ আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্রতা। ইসলামি পরিভাষায় তাহারাত বলতে দেহ, মন, পোশাক, স্থান বা পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে বোঝায়। আল্লাহর ইবাদাত করার পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। ওযু, গোসল, তায়াম্মুম ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। ইবাদাতের জন্য পবিত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। পবিত্র না হয়ে সালাত আদায় করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, ‘পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল হয় না।’ (মুসলিম)

পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে। লেখাপড়া ও কাজকর্মে মন বসে। ভালো কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি তাঁর উম্মতকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন এবং পবিত্র থাকার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন - ‘পবিত্রতা ইমানের অংশ।’ (মুসলিম)

তাহারাত বা পবিত্রতার প্রকারভেদ

পবিত্রতা দুই প্রকার: ১. বাহ্যিক পবিত্রতা ২. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা

বাহ্যিক পবিত্রতা: ইবাদাতের প্রস্তুতির জন্য শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ইবাদাতের স্থান পবিত্র করতে হয়। শারীরিক পবিত্রতা লাভের মাধ্যম হলো ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম। শরিয়তের বিধি অনুযায়ী ওযু, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনই বাহ্যিক পবিত্রতা।

অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা: দেহের পাশাপাশি মনকেও যাবতীয় পাপ চিন্তা থেকে মুক্ত করতে হয়। কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হয়। ভবিষ্যতে ভালো কাজ করার অঙ্গীকার এবং পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প করতে হয়। এতে দেহ ও মন পবিত্র হয় এবং আল্লাহর ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়। এটাই অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা।

নাজাসাত (اَلنَّجَاسَةُ)

'নাজাসাত' আরবি শব্দ। এর অর্থ অপবিত্রতা। এটি তাহারাত বা পবিত্রতার বিপরীত। শরীর থেকে যেসব জিনিস বের হওয়ার কারণে শরীর অপবিত্র হয়ে যায় অথবা যে সব দ্রব্য কোনো পবিত্র বস্তুতে লাগলে তা অপবিত্র হয়ে যায়, তাকে নাজাসাত বা অপবিত্রতা বলা হয়। যেমন : মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি। নাজাসাতের কারণে শরীর, কাপড় ও ব্যবহারিক জিনিসপত্র অপবিত্র হয়ে যায়। এ অবস্থায় তা পবিত্র করা একান্ত জরুরি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

অর্থ: 'যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে যাও তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)

নাজাসাত বা অপবিত্রতার প্রকারভেদ

নাজাসাত দুই প্রকার: ১. নাজাসাতে হাকিকি বা প্রকৃত অপবিত্রতা ২. নাজাসাতে হুকমি বা অপ্রকৃত অপবিত্রতা

নাজাসাতে হাকিকি: নাজাসাতে হাকিকি বলতে ঐ সকল অপবিত্র বস্তুকে বোঝায় যেগুলো প্রকৃতিগতভাবেই অপবিত্র এবং ইসলামি শরীয়ত সেগুলোকে অপবিত্র ঘোষণা করে। ঐ সকল অপবিত্র বস্তুকে মানুষ অপছন্দ করে। যেমন : প্রস্রাব, পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি। ইসলাম এসব থেকে শরীরকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

নাজাসাতে হুকমি: নাজাসাতে হুকমি হচ্ছে ঐ সকল অপবিত্রতা যা দেখা যায় না কিন্তু ইসলামি বিধানে তা নাজাসাত বা অপবিত্র বলে গণ্য। যেমন : ওযু ভঙ্গ হওয়া, গোসলের প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকার অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায়সমূহ

আল্লাহ তা'আলা নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি ও পবিত্র বস্তুকে পছন্দ করেন। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি। ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জনের উপায়গুলো হলো-

১. **ওযু:** শরীর পবিত্র করার নিয়তে পাক-পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী মুখমণ্ডল, দুই

হাত (কনুই সহ) ও দুই পা (টাখনু সহ) ধৌত করা এবং মাথা মাসাহ্ করার নাম ওযু। যে পানি দিয়ে ওযু করা হবে তা অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যেমন- নদী, খাল, পুকুর, কূপ, ঝরণা, নলকূপ বা শহরে সরবরাহ করা পানি।

২. **গোসল:** পবিত্র পানি দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে পুরো শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে। গোসলের মাধ্যমে পুরো শরীর পবিত্র হয়ে যায়।

৩. **তায়াম্মুম:** পানি পাওয়া না গেলে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোগী পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে, মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ্ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলে।

ইসলাম মনের পবিত্রতার ওপর খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। খ্যাতিমান ইসলামি পন্ডিতগণ মনের ১০টি মৌলিক রোগ চিহ্নিত করেছেন। তা হলো লোভ, উচ্চাশা, রাগ, মিথ্যা বলা, গিবত (পরনিন্দা), কার্পণ্য, অহংকার, রিয়া (লোক দেখানো), হাসাদ (হিংসা)। উপর্যুক্ত পাপগুলো থেকে বেঁচে থাকলে মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ ছাড়া ইসলামের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবগুলো যথাযথভাবে আদায়ের মাধ্যমে মনের পবিত্রতা অর্জন করা যায়। কোনো মুমিন যদি ইবাদাতের পাশাপাশি হালাল খাদ্য গ্রহণ করেন, হারাম থেকে বেঁচে থাকেন, কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং সদা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করেন তবে তাঁর অন্তর পবিত্র থাকবে। এবার আমরা পবিত্র থাকার লক্ষ্যে ওযু, গোসল এবং তায়াম্মুমের নিয়মগুলো জেনে নেবো।

ওযু (اَلْوُضُوْءُ)

ওযু আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়- পবিত্রতা অর্জনের জন্য শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী মুখমণ্ডল, দুই হাত (কনুইসহ) ও দুই পা (টাখনুসহ) ধৌত করা এবং মাথা মাসাহ্ করার নাম ওযু। এ চারটি কাজ ওযুর ফরজ। তবে কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ইত্যাদি ওযুর সুন্নাত

ওযুর গুরুত্ব

ওযু ব্যতীত সালাত আদায়, কাবাঘরের তাওয়াফসহ বেশ কিছু ইবাদাত করা যায় না। ভালোভাবে ওযু করলে মন প্রফুল্ল থাকে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ থাকে। ইবাদাতেও একাগ্রতা আসে। ওযুর ফজিলত সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, ‘আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে চিনতে পারবো।’ জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনি কীভাবে আমাদের চিনবেন? নবি করিম (সা.) উত্তরে বললেন, ‘ওযুর ফলে আমার উম্মতের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বলতায় চকচক করবে। তাতেই আমি আমার উম্মতকে চিনতে পারব।’ (বুখারি ও মুসলিম)

ওযুর নিয়ম

ওযু করার জন্য প্রথমে পবিত্রতার নিয়তে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতে হবে। এরপর দুই হাতে পানি নিয়ে কবজি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করতে হবে। এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের আঙুল খিলাল করতে হবে। এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে। গড়গড়া করে কুলি করা উত্তম। তবে রোযাদার হলে গড়গড়া করা যাবে না। তারপর নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পুরো মুখমণ্ডল তিন বার এমনভাবে ধৌত করতে হবে যাতে চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে। যাদের ঘনদাড়ি আছে, তারা আঙুল দিয়ে দাড়ি খিলাল করবে। এরপর ডান হাত কনুইসহ তিন বার ধৌত করবে। একই সঙ্গে ডান হাত দিয়ে বাম হাত কনুইসহ তিন বার ধৌত করবে। হাতে ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি থাকলে তা এমনভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে, যাতে সবখানে ভালোভাবে পানি পৌঁছে যায়। অতঃপর দুই হাত ভিজিয়ে মাথা মাসাহ্ করবে। সবশেষে দুই পা টাখনুসহ ভালোভাবে ধৌত করতে হবে যাতে একটু জায়গাও শুকনো না থাকে। যদি ওযু করার স্থানে ক্ষত বা ব্যান্ডেজ থাকে আর রোগী যদি আশঙ্কা করে যে, পানি লাগলে ক্ষতস্থানের ক্ষতি হবে, এমতাবস্থায় ঐ স্থানের চারপাশে পানি দিয়ে ধৌত করে শুধু ব্যান্ডেজের ওপরে মাসাহ্ করবে। তবে ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেলে অবশ্যই পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

ওযুর কাজগুলো পরপর করে যেতে হবে। অর্থাৎ এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ধৌত করতে হবে। অনেকক্ষণ থেমে থেমে করা যাবে না।

ওযুর ফরয

ওযুর ফরয চারটি। এ চারটির মধ্যে কোনো একটি বাদ পড়লে ওযু হবে না।

- সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা।
- উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা।
- মাথার চারভাগের একভাগ একবার মাসাহ্ করা।
- উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা।

ওযু ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে ওযু ভঙ্গ হয় তা নিম্নরূপ :

- প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলে।
- শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে গেলে।
- মুখভর্তি বমি হলে। থুথু ও কাশি ব্যতীত বমির সঙ্গে রক্ত, পুঁজ, খাদ্য বা অন্যকিছু বের হলেও ওযু ভেঙে যাবে।
- থুথুর সঙ্গে বেশি পরিমাণ রক্ত এলে।
- শুয়ে অথবা হেলান দিয়ে ঘুমালে।
- নেশাগ্রস্ত হলে।
- বেহুঁশ হলে।
- নামাজে অট্টহাসি দিলে।

অনুশীলন:

শিক্ষকের সহায়তায় নিয়ম মেনে ওযু করা অনুশীলন করো।

গোসল (اَلْغُسْلُ)

গোসল অর্থ ধৌত করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় গোসল বলতে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা পুরো শরীর ধৌত করাকে বোঝায়।

গোসলের নিয়ম

শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে পানি নিয়ে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ভালোভাবে ধৌত করতে হবে। তারপর শরীরের কোনো স্থানে অপবিত্র কিছু লেগে থাকলে তাতে পানি ঢেলে ও প্রয়োজনে হালাল সাবান মেখে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর ভালোভাবে ওযু করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কুলি করার সময় পানি যেন কণ্ঠদেশে প্রবেশ করে অর্থাৎ গড়গড়ার সাথে কুলি করতে হবে। আর নাক পরিষ্কার করার সময় যেন ভিতরে ভালোভাবে পানি প্রবেশ করে। ওযুর পর মাথায় এমনভাবে পানি ঢালতে হবে যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর ডান কাঁধে, তারপর বাম কাঁধে পানি ঢেলে পুরো শরীর ভালোভাবে ধৌত করতে হবে যেন শরীরের কোনো অংশ শুকনো না থাকে। নাভি, বগল ও দেহের অন্যান্য ভাঁজে পানি পৌঁছিয়ে সতর্কতার সঙ্গে ধৌত করতে হবে। সবশেষে পা ধৌত করতে হবে।

গোসলের ফরয

গোসলের ফরয তিনটি। যথা–

১. গড়গড়া করে কুলি করা;
২. নাকের ভেতরে পানি পৌঁছানো;
৩. সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধোয়া।

তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّمُ)

তায়াম্মুম অর্থ ইচ্ছা করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলতে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু (যেমন: পাথর, চুনাপাথর, বালি ইত্যাদি) দ্বারা পবিত্র হওয়ার নিয়তে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসাহ্ করাকে বোঝায়। ওযু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। পবিত্রতা অর্জনের প্রকৃত মাধ্যম হলো পানি। তবে পানি পাওয়া না গেলে অথবা পাওয়া গেলেও পানি ব্যবহারে রোগবৃদ্ধি বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ্ করবে।' (সূরা আল- মায়িদা, আয়াত: ৬)

তায়াম্মুম করার নিয়ম

প্রথমে তায়াম্মুমের নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়বে। তারপর দুই হাতের তালু একটু প্রসারিত করে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু, যেমন: পাথর, চুনাপাথর, বালি ইত্যাদিতে দুই হাত লাগিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসাহ্ করবে। পুনরায় দুই হাত মাটিতে লাগিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করবে। হাতে ঘড়ি বা অন্য কোনো জিনিস থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ করতে হবে।

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। যথা–

১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা;

২. পবিত্র মাটি দিয়ে পুরো মুখমণ্ডল মাসাহ্ করা;

৩. পবিত্র মাটি দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসাহ্ করা।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় তা নিম্নরূপ:

- যেসব কারণে ওযু ভেঙে যায়, সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভেঙে যায়।
- যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।
- পানির অভাবে তায়াম্মুম করার পর পানি পাওয়া গেলে।
- যেসব কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয (বৈধ) ছিল, সেসব কারণ দূর হয়ে গেলে। যেমন: কোনো রোগের কারণে তায়াম্মুম করা হলে, সেই রোগ সেরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তায়াম্মুম ভেঙে যায়।

অনুশীলন:

শিক্ষকের সহায়তায় তায়াম্মুম করার পদ্ধতি অনুশীলন করো।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পবিত্রতার ভূমিকা

আমরা সবাই ভালো থাকতে চাই। ভালো থাকতে হলে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ থাকলে মনে সুখ-শান্তি থাকে না; ফলে নানারকম শারীরিক ও মানসিক রোগ সৃষ্টি হয়। এই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পবিত্রতার ভূমিকা অপরিসীম। ইসলাম পবিত্রতার উপর

অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে। ইসলাম শারীরিক পবিত্রতার সাথে সাথে মানুষের আত্মিক পবিত্রতা, বিশ্বাসের পবিত্রতা, কর্মের পবিত্রতা, আর্থিক পবিত্রতা, পরিবেশের পবিত্রতা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করে। পবিত্রতা শরীরকে রাখে সতেজ ও সবল, মনকে রাখে প্রফুল্ল। ফলে সেই শরীর ও মন থাকে রোগ-জীবাণু থেকে সুরক্ষিত।

অপবিত্রতা থেকে নানারকম রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ নোংরা থাকলে রোগ-জীবাণু ছড়ায়। পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।' (সূরা আল-মুদ্দাছছির, আয়াত: ৪-৫)

বর্তমানে ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিকভাবে 'বিশ্ব হাতধোয়া দিবস' পালিত হয়। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ সংক্রমিত হওয়ার পর দেশের প্রায় সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হাত ধোয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । ইসলামে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযু, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে। দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায়ের জন্য ওযু করতে হয়। ওযু করলে শরীর থেকে যেমন রোগ-জীবাণু ধুয়ে যায়, তেমনি গুনাহসমূহও বের হয়ে যায়। এর মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা অর্জিত হয়।

মানব শরীরে মুখগহ্বর স্পর্শকাতর একটি স্থান। আমরা সারা দিন নানা রকম খাবার গ্রহণ করি। আমরা যদি সব সময় মুখ পরিষ্কার না রাখি তাহলে নানারকম রোগের পাশাপাশি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। তাই মহানবি (সা.) নিয়মিত মিসওয়াক করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন।

শরীরিক পবিত্রতার সঙ্গে মানসিক শান্তি একই সূত্রে গাঁথা। আমরা শারীরিকভাবে পবিত্র থাকলে আত্মিক প্রশান্তি পাবো। মন থাকবে প্রফুল্ল ও সতেজ। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পবিত্রতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সব সময় পবিত্র থাকার এবং আমাদের আশপাশের পরিবেশকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করা উচিত।

তাহলে এতক্ষণ আমরা পবিত্র থাকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং এর বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে জানলাম।

অনুশীলন:

বন্ধুরা মিলে দলগতভাবে পবিত্র থাকার সুফলসমূহ আলোচনা করো।

এবার এসো আল্লাহর ইবাদাতের অন্যতম মাধ্যম সালাত বা নামায সম্পর্কে জেনে নিই।

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

সালাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আহকাম, আরকানসহ বিশেষ নিয়মে ও নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর ইবাদাত করার নাম সালাত (নামায)। ইসলামে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের মধ্যে সালাত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন। পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ: 'এবং তোমরা নামায কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর (আল্লাহ তা'আলার) বান্দা ও রাসুল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, হজ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।' (বুখারি ও তিরমিযি)

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান পুরুষ এবং নারীর ওপর নির্ধারিত সময়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সালাত আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স ১০ বছর হয়, তখন সালাতের ব্যাপারে (প্রয়োজনে) শাসন করো।' (আবু দাউদ)

সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সালাত হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। ইমানের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে সালাত। কুরআন ও হাদিসে অসংখ্য স্থানে সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সালাত এমন একটি ফরয ইবাদাত যার কোনো বিকল্প নেই।

ব্যক্তি জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সালাত বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। সালাত আদায়ের ফলে মনে প্রশান্তি আসে এবং সাহসের সঞ্চার হয়। কোনো বিষয়ে অস্থিরতা দেখা দিলে মহানবি (সা.) সালাত আদায় করতেন। এতে তাঁর মানসিক প্রশান্তি লাভ হতো।

সালাত ব্যক্তির নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক। সালাত মানুষকে পাপকাজ এবং পাপ চিন্তা থেকে বিরত রাখে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ: 'আর সালাত প্রতিষ্ঠা করো; নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আল্-আনকাবূত, আয়াত: ৪৫)

সমাজ জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সালাতের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অশ্লীল ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা যায়। জামাআতে সালাত আদায় করলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। সবার মধ্যে ঐক্য, সংহতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়। জামা'আতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দূর হয়।

সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ এবং বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। মহানবি (সা.) বলেছেন– 'তোমাদের কারও বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে, আর তাতে যদি কেউ দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার গায়ে কি ধুলাময়লা থাকতে পারে?' সাহাবিগণ বললেন– 'না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!' মহানবি (সা.) তখন বললেন– 'একইভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাপ মোচন করে থাকেন।'

সালাতের সময়সূচি

যথাসময়ে সালাত আদায় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। সময় অনুসারে সালাত আদায় করা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

অর্থ: 'নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)

আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে নবি করিম (সা.) কে সালাত আদায়ের পদ্ধতি এবং সালাতের সময় জানিয়ে দিয়েছেন।

সালাতের সময়

ফজর: ফজরের সালাত শুরু হয় সুবহে সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। আকাশের পূর্ব দিগন্তে ভোর রাতে লম্বমান যে আলোর রেখা দেখা দেয়, তাকেই বলে সুবহে সাদিক। আলো ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং শেষে সূর্যোদয় ঘটে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজর সালাতের সময়।' (মুসলিম)

যোহর: সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। কোনো বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া (ছায়া আসলি) ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এই সময় থাকে। ঠিক দুপুরের সময়ে কোনো বস্তুর যেটুকু ছায়া থাকে, তাকেই 'ছায়া আসলি' বা আসল ছায়া বলে। যেমন এক হাত লম্বা একটি কাঠির আসল ছায়া দুপুরবেলা চার আঙুল ছিল। তারপর ঐ কাঠির ছায়া যখন দুই হাত চার আঙুল হবে, তখন যোহরের সময় শেষ হয়ে যাবে। গরমের সময় যোহরের সালাত বিলম্বে এবং শীতের মৌসুমে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা উত্তম।

আসর: যোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করলে আসরের সালাত আদায় করা মাকরুহ। তবে, সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আসর ছাড়া সব ধরনের সালাত নিষিদ্ধ।

মাগরিব: সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা থাকে ততক্ষণ মাগরিবের সময় বাকি থাকে। তাই সময় হওয়ার সাথে সাথে সালাত আদায় করা উত্তম।

এশা: মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর এশার নামাযের সময় শুরু হয় এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যে এশার নামায আদায় করা উত্তম।

বিতর: বিতর সালাতের প্রকৃত সময় শেষরাত। তবে এশার সালাতের পর পরও আদায় করা যায়। কিন্তু এশার আগে পড়া যায় না।

সালাতুল জুমু'আ: যোহরের ওয়াক্তই জুমু'আর ওয়াক্ত। সাধারণত ওয়াক্ত শুরু হলেই আযান দেওয়া হয় এবং ইমামগণ হেদায়াত-নসিহতমূলক বক্তব্য দিয়ে থাকেন। জুমু'আর দুই রাকাআত ফরজ সালাতের আগে ইমাম সাহেব মিম্বারে দাঁড়িয়ে দুটি আনুষ্ঠানিক ভাষণ (খুতবা) দেন। এসময় মুসল্লিদের চুপ থেকে তা শুনতে হয়।

সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। মহানবি (সা.) এর প্রদর্শিত পন্থায় আমাদের সালাত আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা সালাত আদায় করো যেমনিভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছ।' (বুখারি)

বিনীত ও একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করতে হয়। লোক দেখানো কিংবা উদাসীনভাবে আদায় করা সালাত আল্লাহ কবুল করেন না। সালাত আদায়কালে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, সালাতের শর্তগুলোর কোনোটাই যেন বাদ না পড়ে। পবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। মনে করতে হবে যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন।

দুই, তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়মে কিছুটা তারতম্য আছে। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হলো:

দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে নিয়ত করে দুই হাত কান বরাবর ওঠাবো এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে নাভির নিচে হাত বাঁধবো। তবে মেয়েরা কাঁধ পর্যন্ত হাত ওঠাবে এবং হাত বাঁধবে বুকের ওপর।

নিয়ত মনে মনে করলেই চলবে, তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। এরপর 'সানা' পড়ব। তারপর 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' অনুচ্চ আওয়াজে পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ব। ফাতিহা পড়া শেষ হলে মনে মনে আমিন বলবো। এরপর অন্য কোনো সূরার কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি সূরা পড়বো। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকু করব।

রুকুতে কমপক্ষে একবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম' বলব। তারপর 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। দাঁড়ানো অবস্থায় 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলব। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদাহ্ করব। সিজদায় কমপক্ষে একবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলব। প্রথম সিজদাহ্র পর সোজা হয়ে বসব। দু'টি সিজদাহ্ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এভাবে প্রথম রাকআত শেষ হবে। উল্লেখ্য, রুকু ও সাজদায় তিন বা ততোধিক বিজোড় সংখ্যক তাসবীহ পড়া সুন্নাত। এক তাসবীহ পরিমাণ সময় রুকু ও সিজদায় থাকা ফরজ।

এখন দ্বিতীয় রাকআত শুরু হলো। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর পূর্বের মতো সূরা মিলাবো। তারপর প্রথম রাকআতের মতো রুকু ও সিজদাহ করে সোজা হয়ে বসব। তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে প্রথমে ডানে ও পরে বামে মুখ ফিরিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলব। এইভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

তিন রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

তিন রাকআত বিশিষ্ট ফরয সালাতে দ্বিতীয় রাকআতের পর শুধু তাশাহহুদ পড়ব। তারপর তাকবির বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। অন্য কোনো সূরা পড়ব না। এরপর পূর্বের মতো রুকু, সিজদাহ করব। সিজদার পর সোজা হয়ে বসে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয সালাতে দ্বিতীয় রাকআতের পর ১ম বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়ব। পরে তৃতীয় রাকআতের জন্য তাকবির বলে উঠে দাঁড়াব। এরপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর রুকু-সিজদাহ করে চতুর্থ রাকআতের জন্য উঠে দাঁড়াব। চতুর্থ রাকআতে তৃতীয় রাকআতের মতো সূরা ফাতিহা পড়ে রুকু সিজদাহ করার পর ২য় বৈঠকে বসে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব।

ওয়াজিব, সুন্নত বা নফল সালাত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব।

অনুশীলন:

শিক্ষকের সহায়তায় নিয়ম মেনে ওয়াক্ত অনুসারে সালাত আদায় অনুশীলন করো।

সালাতের আহকাম ও আরকান

সালাত আদায় যথাযথ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যার কোনো একটি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। সালাতে মোট ফরয চৌদ্দটি। সালাতের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে সালাতের আহকাম বলা হয়। আর সালাতের ভিতরে সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে সালাতের আরকান বলা হয়। সালাতের আহকাম ও আরকান নিম্নরূপ:

সালাতের আহকাম

১. শরীর পবিত্র হওয়া।
২. পরিধানের কাপড় পবিত্র হওয়া।
৩. সালাতের স্থান অর্থাৎ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা হবে তা পবিত্র হওয়া। কমপক্ষে দাঁড়ানোর জায়গা থেকে সিজদাহর জায়গা পর্যন্ত পবিত্র হতে হবে।
৪. সতর ঢাকা। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং নারীদের মুখমণ্ডল, হাতের কবজি ও পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।
৫. কিবলামুখী হওয়া, অর্থাৎ কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা। কিবলা অজানা হলে নিজের প্রবল ধারণা অনুসারে কিবলা নির্ধারণ করে সালাত আদায় করতে হবে।
৬. সালাতের সময় হওয়া।
৭. নিয়ত করা, অর্থাৎ যে ওয়াক্তের সালাত পড়তে হবে, মনে মনে সেই ওয়াক্তের নিয়ত করা। নিয়ত নিজ নিজ ভাষায়ও করা যাবে।

সালাতের আরকান

১. তাকবিরে তাহরিমা তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করা।
২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে এবং বসতে অক্ষম হলে শোয়া অবস্থায় ইশারায় সালাত আদায় করতে হবে।
৩. কিরাআত পড়া, অর্থাৎ সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করা।
৪. রুকু করা।
৫. সিজদাহ করা।
৬. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা (যে বৈঠকের মধ্যে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা হয় সেটাই শেষ বৈঠক)।
৭. সালামের মাধ্যমে সালাত থেকে বের হওয়া।

দলগত কাজ:

বন্ধুরা মিলে সালাতের আহকাম এবং আরকান সংক্ষেপে পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে সকলের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করো।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের ওয়াজিব বলতে ঐ সব করণীয় বিষয় বোঝায়, যার কোনো একটি ভুলক্রমে ছুটে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' আদায় করে সালাত শুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায় এবং পুনরায় সালাত আদায় করতে হয়। সালাতের ওয়াজিব চৌদ্দটি। এগুলো নিম্নরূপ:

১. প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া।
২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে কোনো একটি সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা।
৩. রুকূ, সিজদাহ ও তিলাওয়াতের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
৪. সালাতের রূকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা। অর্থাৎ রুকু, সিজদাহ, দাঁড়ানো, বসায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা।
৫. রুকূ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
৬. দুই সিজদাহ এর মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৭. প্রথম বৈঠক অর্থাৎ তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকআত আদায়ের পর তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসা।
৮. প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা।
৯. ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ার সালাতে উচ্চস্বরে এবং চুপে চুপে পড়ার সালাতে চুপে চুপে কিরাআত পড়া।
১০. বিতর সালাতে দোয়া কুনুত পাঠ করা।
১১. সালাতের মধ্যে সিজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াতে সিজদাহ করা।
১২. সিজদাহর মধ্যে উভয় হাত ও হাঁটু মাটিতে রাখা।
১৩. দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।
১৪. 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালাত সমাপ্ত করা।

সালাতের সুন্নতসমূহ

রাসুলুল্লাহ (সা.) সালাতের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব ছাড়াও কিছু আমল বা কাজ করেছেন কিন্তু এগুলো আদায়ের ব্যাপারে ফরয ও ওয়াজিবের মতো গুরুত্বারোপ করেননি। এগুলোকে বলা হয় সুন্নত। যদিও এগুলো ছুটে গেলে সালাত নষ্ট হয় না কিংবা সাহু সিজদাহ দিতে হয় না, তবুও রাসুলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণ করে এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সা.) এভাবে সালাত আদায় করেছেন এবং অন্যকেও এভাবে আদায় করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা সালাত আদায় করো, যেভাবে তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ।' (বুখারি)

সালাতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুন্নত নিম্নরূপ:

১. তাকবির-ই-তাহরিমা বলার সময় পুরুষের কানের লতি ও নারীদের কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত ওঠানো।
২. তাকবির বলার সময় দুই হাতের আঙুলগুলো খুলে রাখা এবং কিবলামুখী করে রাখা।
৩. নিয়ত করার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। পুরুষের জন্য নাভির নিচে এবং নারীদের বুকের উপর হাত রাখা।
৪. তাকবির-ই-তাহরিমা বলার সময় মাথা অবনত না করা।
৫. ইমামের জন্য উঁচু আওয়াজে তাকবির বলা।
৬. সানা পড়া।
৭. প্রথম রাকআতে সানা পড়ার পর আউযুবিল্লাহ পড়া।
৮. প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়া।
৯. ফরয সালাতের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া।
১০. সূরা ফাতিহা পাঠের পর আমিন বলা।
১১. সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমিন আস্তে বলা।
১২. এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময় তাকবির বলা।
১৩. রুকু ও সিজদায় তাসবিহ পড়া।
১৪. রুকুতে মাথা ও কোমর সোজা রাখা এবং দুই হাতের আঙুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা।
১৫. রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' ও মুক্তাদির 'রাব্বানা লাকাল হামদ্' বলা।
১৬. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং সবশেষে কপাল মাটিতে রাখা।
১৭. বসার সময় বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা।
১৮. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ পড়া।
১৯. দরুদের পর দোয়া মাসুরা পড়া।
২০. প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম ফিরানো।

সালাতের মুস্তাহাব

মুস্তাহাব অর্থ উত্তম, পছন্দনীয়। ইসলামের পরিভাষায় মুস্তাহাব বলা হয় এমন আমলকে যা পালন করলে সাওয়াব আছে কিন্তু ছেড়ে দিলে কোন গুনাহ হয় না। সালাতের মধ্যে এমন কিছু আমল আছে যা পালন করলে সাওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু পালন না করলে কোনো গুনাহ হয় না।এ গুলোকে সালাতের মুস্তাহাব বলে। অপর পৃষ্ঠায় সালাতের কতিপয় মুস্তাহাব উল্লেখ করা হলো:

১. সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদাহ এর স্থানে দৃষ্টি রাখা
২. রুকু করার সময় পায়ের উপর, সিজদাহর সময় নাকের উপর এবং বসা অবস্থায় কোলের উপর দৃষ্টি রাখা।
৩. সালাতের মধ্যে হাঁচি, কাঁশি দেওয়া ও হাই তোলা থেকে বিরত থাকতে সাধ্যমত চেষ্টা করা।
৪. সালাতে ধীরস্থিরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা।
৫. সিজদাহ আদায়কালে উভয় হাতের মাঝখানে মাথা রাখা।
৬. মাগরিব সালাতে ছোট সূরা পাঠ করা।
৭. একাকী সালাত আদায়কালে রুকু ও সিজদাহর তাসবিহ তিনবারের বেশি (পাঁচ, সাত, নয় ইত্যাদি) পড়া।

সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ

সালাতের শুরুতে আমরা নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধি। একে বলা হয় তাকবির-ই-তাহরিমা। এ তাকবির বলার পর সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাড়া অন্য কোনো কাজ বা কথা বলা হারাম হয়ে যায়। যদি কেউ এমন করে ফেলে, তবে তার সালাত বাতিল হবে। সালাত বাতিল বা ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. সালাতের মধ্যে কাউকে সালাম দিলে বা সালামের উত্তর দিলে।
২. সালাতের মধ্যে কথা বললে।
৩. কিছু খেলে।
৪. কিছু পান করলে।
৫. শব্দ করে অট্টহাসি হাসলে সালাত এবং ওযু উভয়ই ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৬. বিপদ বা কষ্টের কারণে উচ্চস্বরে কাঁদলে।
৭. ব্যথা বা রোগের কারণে 'উহ্ আহ্' এরূপ শব্দ করলে।
৮. সালাতে কুরআন মাজিদ দেখে পড়লে।
৯. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরালে।
১০. দুই হাত দিয়ে কোনো কাজ করলে।
১১. মুক্তাদি ইমাম অপেক্ষা সামনে দাঁড়ালে।
১২. নাপাক স্থানে সিজদাহ করলে।
১৩. সালাতে দুনিয়ার কোনো কিছু প্রার্থনা করলে।
১৪. বিনা কারণে বারবার কাশি দিলে।
১৫. সালাতের কোনো ফরয বাদ গেলে।
১৬. কোনো সুসংবাদে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে।
১৭. কোনো দুঃসংবাদে 'ইন্নালিল্লাহ' বললে।
১৮. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে।
১৯. হাঁচির উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললে।
২০. নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভুল ধরলে।
২১. আমলে কাসির করলে (এমন কাজ করা যা দেখলে কেউ মনে করবে যে সে সালাত আদায়ে রত নয়)।

সালাত মাকরুহ হওয়ার কারণ

মাকরুহ অর্থ অপছন্দনীয়। এমন কিছু কাজ আছে যা সালাতের মধ্যে করা হলে সালাত নষ্ট হয় না কিন্তু সাওয়াব কম হয়, সেগুলো সালাতের মাকরুহ কাজ। সালাতের এমন কিছু মাকরুহ কাজের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো: ১. সালাতের মধ্যে ইচ্ছাকৃত আঙ্গুল মটকানো। ২. অলসতা করে খালি মাথায় সালাত আদায় করা। ৩. পরিধানের কাপড় ধূলাবালি থেকে রক্ষা করার জন্য গুটিয়ে নেওয়া। ৪. পরিধানের কাপড়, জামার বোতাম, দাড়ি ইত্যাদি অহেতুক নাড়াচাড়া করা। ৫. অশালীন ও ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা। ৬. প্রস্রাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করা। ৭. সালাতের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো। ৮. সিজদাহর সময় দুই হাত কনুই পর্যন্ত জমিনে বিছিয়ে দেওয়া। ৯. ইমামের মিহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো। ১০. প্রাণির ছবিযুক্ত কাপড় পরে সালাত আদায় করা। ১১. সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনে একাকী দাঁড়ানো। ১২. সালাতের মধ্যে ইশারায় অন্যকে সালাম করা। ১৩. শুধু কপাল বা শুধু নাক মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদাহ করা। ১৪. বিনা কারণে শুধু ইমামের উঁচুস্থানে দাড়ানো। ১৫. বিনা কারণে চারজানু হয়ে বসা। ১৬. চোখ বন্ধ করে সালাত আদায় করা। ১৭. তিলাওয়াত পূর্ণ না করেই রুকুর জন্য ঝুঁকে পড়া। ১৮. সিজদার সময় মাটি থেকে পা উঠানো। ১৯. সালাতের মধ্যে আয়াত ও অন্যান্য তাসবিহ হাতের আঙ্গুল দিয়ে গণনা করা। ২০. মুখের ভিতরে এমন বস্তু রাখা যাতে তিলাওয়াতে অসুবিধা হয়।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময়ে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ: ১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়। ২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। ৩. সূর্যাস্তের সময়, আর কোনো কারণে ঐদিনের আসরের সালাত আদায় করতে না পারলে তা ঐ সময় আদায় করা যাবে তবে মাকরুহ বা অপছন্দনীয়ভাবে আদায় হয়ে যাবে।

সালাতের মাকরুহ সময়

১. ফজরের সালাত আদায়ের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। ২. আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ৩. ফজরের সময় শুরু হলে ফজরের সুন্নত ছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করা। ৪. ফরয সালাতের যখন তাকবির দেওয়া হয় তখন অন্য কোন সালাত শুরু করা। ৫. যখন ইমাম সাহেব জুমুআর খুতবা দিতে থাকেন তখন কোনো সালাত শুরু করা। ৬. বিনা কারণে এশার সালাত মধ্যরাতের পরে আদায় করা।

সিজদাহ্ (اَلسَّجْدَةُ)

'সিজদাহ্' আরবি শব্দ। এর অর্থ মাথা অবনত করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বান্দাহ তার কপাল জমিনে রাখাকে সিজদাহ্ বলে। সিজদাহ্ এমন এক সম্মাননা, যা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। মাটিতে কপাল ও নাক স্পর্শ করে সিজদাহ্ করতে হয়। একইসাথে সিজদার সময় উভয় পায়ের হাটু এবং উভয় হাতের তালু মাটিতে স্থাপন করতে হয়। সিজদাহ্ কিবলার দিকে মুখ করে দিতে হয়।

সিজদাহ্ -এর প্রকারভেদ

ফরয সিজদাহ্: মানুষ নামায আদায়ের সময় যেসব সিজদাহ্ দিয়ে থাকে তাকে ফরজ সিজদাহ্ বলে।

ওয়াজিব সিজদাহ্: ভুলবশত নামাযে কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে এবং সিজদাহ্-এর আয়াত তিলাওয়াত করলে যে সিজদাহ্ দিতে হয় তাকে ওয়াজিব সিজদাহ্ বলে।

মুস্তাহাব সিজদাহ্: খুশির সংবাদ শুনে, কোনো নিয়ামতপ্রাপ্ত হলে বা বিপদমুক্ত হলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যে সিজদাহ্ দেওয়া হয় তাকে মুস্তাহাব সিজদাহ্ বলে।

সিজদায়ে সাহু: সিজদায়ে সাহু অর্থ ভুলের জন্য সিজদাহ্। ভুলবশত নামাযে ওয়াজিব বাদ পড়লে, তা সংশোধনের জন্য নামাযের শেষ বৈঠকে দুটি সিজদাহ্ করা হয়, একেই সিজদায়ে সাহু বলে।

সিজদায়ে সাহু আদায় করার নিয়ম

নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফেরাব। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযের সিজদাহ্-এর ন্যায় দু'টি সিজদাহ্ করে তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়া মাসুরা পড়ব। তারপর দুইদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব। সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমাদের কারও সালাতে সন্দেহ হলে সঠিকটি ভেবে নিয়ে সালাত সম্পূর্ণ করে একবার সালাম ফেরাবে তারপর দুটি সাজদাহ্ করবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. ভুলবশত নামাযের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে;

২. নামাযের কাজগুলো পরপর আদায় করতে বিলম্ব করলে (যেমন: সূরা ফাতিহা পড়ার পর চুপ করে থাকলে, কছুক্ষণ চুপ থাকার পর কোনো সূরা পড়লে);

৩. কোনো ফরয আদায় করতে বিলম্ব হলে।

৪. নামায আদায়ে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম হলে (যেমন: রুকুর আগেই সিজদাহ্ করলে);

৫. কোনো ফরয একবারের স্থলে একাধিকবার হলে;

৬. কোনো ওয়াজিবের রূপ পরিবর্তন করলে (যেমন: সরবে তিলাওয়াতের স্থলে নীরবে এবং নীরবে তিলাওয়াতের স্থলে সরবে পড়লে) ইত্যাদি।

৭. মনে রাখা দরকার, প্রথম বৈঠক করতে ভুলে গেলে যদি দাঁড়ানোর পূর্বেই মনে পড়ে তাহলে বসে যাব এবং বৈঠক পূর্ণ করব। আর যদি দাঁড়ানোর পর বা প্রায় দাঁড়াবার কাছাকাছি অবস্থায় মনে পড়ে তাহলে বসব না। নামায শেষে সাহু সিজদাহ্ করব।

সিজদায়ে তিলাওয়াত (سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ)

পবিত্র কুরআন মাজিদে কতগুলো আয়াত আছে যা পড়লে বা শুনলে সিজদাহ্ করা জরুরি। সিজদাহ্ আদায় না করলে গুণাহগার হবে। হাদিসে আছে, 'যখন কেউ সিজদাহ্-এর আয়াত পড়ে সিজদাহ্ করে তখন শয়তান একপাশে বসে বিলাপ করতে থাকে এবং বলে, হায় আফসোস! আদম সন্তানদের সিজদাহ্-এর হুকুম দেওয়া হলো, তারা সিজদাহ্ করল এবং জান্নাতের দাবিদার হলো। আর আমাকে সিজদাহ্-এর হুকুম দেওয়া হলো আমি অস্বীকার করে জাহান্নামি হলাম।' (মুসলিম)

সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে সরাসরি সিজদায় চলে যাবে এবং সিজদাহ্ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াতে হবে। তাশাহহুদ পড়া ও সালাম ফেরানোর প্রয়োজন নেই। সিজদায়ে তিলাওয়াতে একটি সিজদাহ্ করলেই চলবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের চারটি শর্ত

১. তাহারাত অর্থাৎ পবিত্র হওয়া;

২. সতর ঢাকা;

৩. কিবলামুখী হওয়া;

৪. সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করা।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থান

১. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ২০৬	২. সূরা আর রা'দ, আয়াত : ১৫
৩. সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৫০	৪. সূরা বানি ইসরাইল, আয়াত : ১০৯
৫. সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৮	৬. সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত : ১৮ , ৭৭
৭. সূরা আল- ফুরকান, আয়াত : ৬০	৮. সূরা আন-নামল, আয়াত : ২৬
৯. সূরা আস্ সাজদাহ্, আয়াত : ১৫	১০. সূরা সোয়াদ, আয়াত : ২৪
১১.সূরা হা-মীম-আস-সাজ্দা, আয়াত : ৩৮	১২. সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৬২
১৩.সূরা আল-ইনশিকাক, আয়াত: ২১	১৪. সূরা আল-'আলাক, আয়াত : ১৯

কাজ:

শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং সূরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থানসমূহ ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের শিক্ষা

সালাত বা নামায ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এর সঙ্গে নৈতিকতার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামের বিধান মেনে নিয়মিত সালাত আদায় করলে যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, সেই সঙ্গে মানুষের নৈতিক চরিত্রেরও উন্নতি ঘটে।

নিয়মিত সালাত আদায়ের ফলে একজন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রের যেসব উন্নয়ন ঘটে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো—

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	সালাত আদায়কারীকে অবশ্যই পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। সালাত আদায়ের আগে আমাদেরকে ওযু করতে হয় যা আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। এভাবে সালাতের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার শিক্ষা পায়।
সময়ানুবর্তিতা	সালাত আদায়ের নির্ধারিত সময় রয়েছে। একজন মুমিন ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করেন। এভাবে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজেও সময়নিষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা পায়।
শৃঙ্খলা	শৃঙ্খলা অর্থ হলো নির্ধারিত কিছু নিয়মনীতি। একজন ব্যক্তি সালাত একা আদায় করুক বা জামাআতে আদায় করুক, তাকে কিবলামুখী হতে হয়। জামাআতে সালাত আদায় করলে ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হয়। এভাবে একজন ব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জেগে ওঠে।
একাগ্রতা	আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য একজন মুমিন ব্যক্তিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে সালাত আদায় করতে হয়। এ সময় মন স্থির রাখতে হয়। মনে কোনো রকম অস্থিরতা কাজ করলে সঠিকভাবে সালাত আদায় করা যায় না। এভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একাগ্রতার শিক্ষা লাভ করেন।
সাম্য	জামাআতে সালাত আদায়কারী মুসুল্লিগণ মসজিদে একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই উদ্দেশ্য নিয়ে সালাত আদায় করেন। এ সময় ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় কোনো ভেদাভেদ থাকে না। এখানে সবাই সমান। এটি ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের প্রতীক। এভাবে সালাত থেকে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজজীবনেও সাম্যের চর্চার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।